পঞ্চম অধ্যায়
মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরীতির বিশ্লেষণ

বাংলা গদ্যের পটভূমি

মীর মশাররফ হোসেন যখন বাংলা গদ্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন গদ্যের একটি আদল তৈরি হয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাই হয় এই গদ্য-চর্চার মাধ্যমে। উনিশ শতকের শুরুতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর হাতে আধুনিক গদ্য-চর্চার সূচনা। তখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কে বলা যেতে পারে গদ্যের প্রস্তুতিকাল।[১]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-গোষ্ঠী সাধু গদ্যরীতির ব্যবহার করলেও যথার্থ ছাঁদটি তাঁরা তখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই তাঁদের কেউ সংস্কৃতরীতি, কেউ ফারসী-রীতি, কেউ বা ইংরেজি ধরণের অন্বয় অনুসরণ করেছিলেন – কেউ কেউ আবার মুখের সাধারণ কথাকেও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।[২] অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা গদ্যরচনার পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগিয়েছেন। তবে তাঁরা বাংলা গদ্যকে বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। রামমোহন রায় গদ্যকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুললেন। তাঁর রচনায় সাহিত্যরস ছিল না, তবে তাঁর ভাষা ছিল বক্তব্যের উপযোগী ও প্রাঞ্জল। বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকাও গদ্যের পুষ্টি সাধনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন থেকে শুরু করে সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিকপত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় পাত্রিকাকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্য ক্রমশঃ সরল হতে থাকে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– "সাময়িকপত্রের আগে বা সমকালে রচিত বাংলা গদ্যের জড়তা ঘোচেনি, কিন্তু সাময়িকপত্রে ব্যবহৃত গদ্যের চাল অনেকটা স্বাভাবিক ও সহজ হয়েছিল।"[৩] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য একটি সার্থক সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। তাঁর পূর্বে বিভিন্ন ধরণের একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হওয়ার কারণে রচিত হতো দীর্ঘ বাক্য। ফলে ভাবের বিরুদ্ধতা এবং বাক্যের ভারসাম্যহীনতার জন্য রচনা নিতান্ত কর্কশ এবং লালিত্যহীন হত। বিদ্যাসাগর আনলেন লালিত্য ও কমনীয়তা। তিনি বাংলা গদ্যে যতি সন্নিবেশ করে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দ বিন্যাস করে তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন।[৪] তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষাকে সুসংহত করে তাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দিয়েছেন।[৫] উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন'-এর পর বাংলা গদ্যে সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি অনুসারে গদ্যচর্চা হতে থাকে। বিদ্যাসাগর সেই সাধুগদ্যের ছাঁদ তৈরি করে দেন। কিন্তু এ সময়েই প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরীয় রীতি গ্রহণ না করে প্রচলিত ভাষার কাছাকাছি একটি রীতিতে যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রচনা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালে' চলিত ভাষার আদলে বাংলা গদ্যে যে নতুন ভঙ্গির প্রবর্তন করলেন তাতে দেখা গেল সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের বদলে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের বহুল প্রয়োগ, সমসবদ্ধ পদের পরিবর্জন এবং কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ফারসী শব্দ ও ইডিয়মের যথেচ্ছ প্রয়োগ। অবশ্য পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ নিজেও এ রীতি অনুসরণ করেননি। তাই দেখা যাবে তিনি একই বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন।[৬] কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' একেবারে কথ্যভাষার আদলে রচিত। এতে কলকাতার আঞ্চলিক ভাষার ছাপ লক্ষ করা যায়। তবে

'আলালের ঘরের দুলাল-এর মতো এ বইয়ে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সাধু ভাষার মিশ্রণ নেই। এ ভাষার প্রধান গুণ সাবলীলতা ও সরসতা। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষার গদ্যকে বিষয়, ভাব ও রসের বাহন করে তুললেন। লিখিত ভাষা ও মনের ভাষার দূরত্ব কমে এল। পরবর্তীকালে বাংলা গদ্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথচৌধুরীর হাতে আরো পরিশীলিত হয়ে বিচিত্রমুখী ও পরিণত রূপলাভ করে। গদ্যভাষার এই ভাঙ্গাচোরার খেলা আজও চলেছে। আমাদের আলোচ্য মীর মশাররফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্রের কালেই আবির্ভূত হন। তিনি সেকালের রীতি অনুসারেই গদ্য-চর্চা করেছেন এবং নিজস্ব ভঙ্গি ও স্বকীয়তার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সেকালে অনেক পণ্ডিতদের[৭] ধারণা হয়েছিল যে মুসলমান লেখকগণ মিশ্রভাষারীতি ছাড়া বিশুদ্ধ বাংলা বা সাধু বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অক্ষম। মীর মশাররফ এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে শুদ্ধ বাংলা গদ্যচর্চায় কৃতিত্ব দেখান। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, মুসলমান লেখকদের মধ্যে তাঁর পূর্বে কয়েকজন গদ্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেও তাঁদের গদ্য 'মহৎ শিল্পের বাহন হবার যোগ্য হয়ে ওঠেনি'।[৮]

মীর মশাররফের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলা গদ্যের এই পরিপ্রেক্ষিতে মীর যখন গদ্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তখন বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য বাংলাভাষাকে ভাবপ্রকাশের স্থিতিস্থাপকতা এনে দিয়েছে। যদিও বাঙালী মুসলমানদের বাংলা গদ্য রচনার জড়তা তখনও কাটেনি, মীর কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ স্থির করে নিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী সাহিত্যচর্চা বাংলা গদ্যভাষাকে অবলম্বন করেই হবে। বাংলা গদ্যভাষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল দ্বিধাহীন এবং স্বচ্ছ। এ ছাড়া তিনি সাহিত্যে এই ভাষা ব্যবহারের বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। সেগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা আগেই বাংলায় সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে বাঙালী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছি। বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বিধা ছিল। মশাররফ কিন্তু তখন স্পষ্টভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাত দেখান। 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

> ১. বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশ-ভাষা বা মাতৃভাষা 'বাংলা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। . . . ইস্তক ঘরকন্নার কার্য্য নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্য্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রয়োজন।[৯]

'রত্নবতী' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন ঃ

> ২. ভাষাসঙ্গতি ও গল্পের বুনন যতদূর পরিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই।[১০]

'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে মহরম পর্বের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

> ৩. . . . মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয় প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদসিন্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল। বিজ্ঞমণ্ডলী ইহাতে যদি কোন প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জ্জনা করিবেন।[১১]

'বিষাদসিন্ধু'র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমালোচকরা এর ভাষা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এর জবাবেই তিনি জানান—

> ৪. বিষাদসিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মুর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর

কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বে বাঙলা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। (উদ্ধারপর্ব, চতুর্থ প্রবাহ)।[১২]

এখানে উদ্ধৃত ১ নং উক্তি থেকে বোঝা যায় সেকালে বাঙালী মুসলমান সমাজ মাতৃভাষার প্রশ্নে বাংলা না উর্দুকে গ্রহণ করবেন তা নিয়ে টানাপোড়েনে ছিলেন। মশাররফ তখন নির্দ্বিধায় বাংলাকেই সাহিত্যচর্চার বাহন করার পক্ষপাতী ছিলেন। ২নং উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'রত্নবতী' থেকেই তিনি সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ৩নং মন্তব্যে তিনি জাতীয় শব্দ বলতে বস্তুত আরবী ফারসী শব্দকেই বুঝিয়েছেন। এই তৃতীয় এবং ৪নং মন্তব্যে তিনি সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর মত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আসলে তিনি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত তৎসম শব্দনির্ভর গদ্যভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য শব্দ ছাড়া বেশি আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে তাঁর অনীহা ছিল। কেননা উনিশ শতকে বাংলাদেশে হিন্দু সাহিত্যিকগণ বাংলা গদ্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারকে 'অসাহিত্যিক কাজ' বলে নিন্দে করতেন। তখন সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশংসা প্রয়োজন ছিল। তাঁরাই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য মুসলমান লেখকদের বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১৩] অবশ্য সামাজিক ও শাস্ত্রীয় কারণে তিনি আরবী ফারসী ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবু এই ভাষার প্রশ্নে তাঁকে সমসাময়িক মুসলমান সমালোচকের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এ সব ক্ষেত্রে মীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি উনিশ শতকের প্রবহমান গদ্যশৈলীর নির্মাণে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হওয়াকেই গৌরবের বিবেচনা করতেন। সমকালীন 'মুসলমানী' শব্দ স্রোতের গড্ডলিকা প্রবাহে অনর্থক অবগাহনে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। অবশ্য আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারে তাঁর কোন অশ্রদ্ধা ছিল না, কেবল তিনি অনর্থক কোন বিদেশি শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।[১৪] বরং তৎকালীন বাংলা ভাষা সাহিত্যের যে মূল প্রবাহ তারই সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করে রাখতে চেয়েছিলেন।

মীর মশাররফের গদ্যরীতি

মীরের প্রধান প্রধান গদ্য রচনাগুলিকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্যে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যেমন–

১. উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক রচনা
২. প্রবন্ধ জাতীয় রচনা
৩. নাটক ও প্রহসন জাতীয় রচনা

১. উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক রচনা

রত্নবতী

'রত্নবতী'র কাহিনী ও সংলাপ – উভয়ই পুরোপুরি সাধুগদ্যরীতিতে রচিত। এর ভাষা তৎসম শব্দ-নির্ভর গদ্য। তবে সেকালের প্রেক্ষাপটে এর গদ্যভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণ-মণ্ডিত। মীরের প্রথম রচনা হলেও সাধুচলিতে কোন মিশ্রণ-দোষ এতে নেই। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায় ঃ

এদিকে সূর্য্য অস্ত হইল। নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোরঞ্জন করিতে করিতে

> পূর্বদিক হইতে উদিত হইলেন। ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন। নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না। (২য় পরিচ্ছেদ)।

উদ্ধৃত অংশ থেকে 'রত্নবতী'র গদ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ১. তৎসম শব্দবহুল ভাষার প্রয়োগ, ২. অসমাপিকা ক্রিয়াপদযোগে বাক্য দীর্ঘায়িত, অথচ বাক্য সরল, ৩. অলঙ্কার প্রয়োগে গদ্যকে সৌন্দর্যভূষিত করবার প্রবণতা এবং ৪. সমাজবদ্ধ পদের ব্যবহার। এই গ্রন্থের ভাষার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, হয়তো এর বিষয় ও পরিবেশের কারণে এতে একটিও আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' মন্তব্য করেছিল যে, কোন অমুসলমান লেখক মুসলমানী ছদ্মনামে গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৫]

'রত্নবতী' গ্রন্থের গদ্যে স্ত্রী-লিঙ্গের বিশেষণে বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—চতুরা সহচরী, ইচ্ছানুবর্ত্তিনী কিঙ্করী প্রভৃতি। সংস্কৃত রীতির সম্বোধনের বিভক্তিও ব্যবহার করেছেন। যেমন — মিত্র, প্রভো, বৎসে ইত্যাদি। "মিত্র! বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না"[১৬] (পৃ.৫০)। "বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি" (পৃ. ৬৪)। "প্রভো ! এখন উপায় কি দেখিতেছ" (পৃ. ৭৩)।

আলাপচারিতার ঢঙে পাঠকদের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে নিয়ে কাহিনী উপস্থাপন কৌশল এতে অনুসৃত হয়েছে। যেমন—

> পাঠক মহাশয় ! রাজকুমার সুকুমার রত্নপুরের কারাগারে থাকুক, আসুন আমরা মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায় ? আসুন, দেখিতে পাইবেন। (২য় পরিচ্ছেদ)।

চরিত্রের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী হয়েছে এ গদ্য। ঘটনার পরিস্থিতি বোঝাতে তিনি গদ্যকে কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাময় করে তুলতেও সক্ষম হয়েছেন। এই উপাখ্যানের রাজকুমার সুকুমারের আসন্ন বিপদের মুহূর্তকে লেখক এভাবেই বর্ণনা করেছেন,—

> এই সময় দিননাথ অস্তাচলে গমন করিলেন। দিকসকল যেন ভূপতিপুত্রের ভাবী দুঃখেই মলিনা হইল। নির্ব্বোধ রাজপুত্র দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া রজনীর অন্তকাল মুহুর্মুহুঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

এই উপাখ্যানে যমক, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য দানও করেছেন। যেমন—

যমক — মহারাজ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের চিন্তা অন্তর করুন। (পৃ. ৭৪)।

উপমা — উভয়ের চিত্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়-হিল্লোল বহিতে লাগিল।

সমাসোক্তি — কুমুদিনী কান্ত বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল। (পৃ. ৭৫)।

চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন—

> শশিসীমন্তিনী যামিনী রাজপুত্রের ভাবী দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গমন সময়ে বিহগকুলের কলরবই ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। (১ম পরিচ্ছেদ)।

'রত্নবতী'র ভূমিকায় মশাররফ ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন তা জানিয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহার যে তিনি করতে পেরেছেন তার প্রমাণও এতে আছে। এ কারণে সেকালে অনেক সমালোচক এর বিষয়বস্তু বা কাহিনী-নির্মাণের তেমন প্রশংসা না করলেও ভাষার সৌন্দর্য বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর ভাষাকে যেমন অতি সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ[১৭] বলে বর্ণনা করেছে, তেমনি 'রহস্য সন্দর্ভ' মন্তব্য করে – "ইহার রচনা কোন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"[১৮] এমন কি একালের সমালোচকগণও এর রচনাগুণের প্রশংসা করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "এর ভাষাভঙ্গিমা পরিচ্ছন্ন সাধু রীতিকেই অনুসরণ করেছে। প্রায় কোথাও জড়তা বা অনভ্যস্ততা নেই।"[১৯] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে ডঃ কাজী আবদুল মান্নান বলেন, "মশাররফ হোসেনের প্রতিভার চমৎকারিত্ব এই যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তাঁর প্রথম গ্রন্থেই বলিষ্ঠ এবং সুললিত ভাষা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।"[২০] সুতরাং দেখা যায়, 'রত্নবতী' প্রথম রচনা হলেও এর গদ্যরীতি ও ভাষাভঙ্গিমায় মশাররফ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এরই আরো বিকশিত রূপ লক্ষ করা যাবে 'বিষাদসিন্ধু'তে।

বিষাদসিন্ধু

'বিষাদসিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর ভাষা। এই ভাষায় বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী প্রভাব[২১] লক্ষ করা গেলেও সচেতন পাঠক 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষাশৈলীতে মীরের অনন্যতা আবিষ্কার করতে পারবেন।

'বিষাদসিন্ধু' সাধু গদ্যভাষায় রচিত। সবই সাধুরীতির দীর্ঘ ক্রিয়াপদ। অধিকাংশ শব্দ তৎসম। তবে তৎসম শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য নেই। এমনকি পূর্ববর্তী 'রত্নবতী' গ্রন্থের তুলনায় এতে তৎসম শব্দের হার অনেক কম। আবার তৎসম শব্দের প্রাধান্যের তুলনায় আরবী ফারসী শব্দের সংখ্যা অতি নগন্য। জনৈক সমালোচক জানিয়েছেন, 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে আনুমানিক একলক্ষ শব্দ রয়েছে, এর মধ্যে দুই শতেরও কম আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (পুনরুক্তি ছাড়া)।[২২] তাও যে তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ব্যবহার করেছেন এমন নয়। নেহাৎ শাস্ত্র ও সমাজের অনুশাসনের দিকে তাকিয়ে তা করেছেন। এছাড়া বিষয়, পরিস্থিতি ও পাত্রভেদে কখনো কখনো লোক-ব্যবহারের প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সাধুসম্মত গদ্য বাক্যের সচলগতিকে তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন।

শব্দ প্রয়োগের চরিত্রটি বুঝতে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

> ঈশ্বর-প্রণয়ী এব্রাহিম, – যাঁহাকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরূদ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সত্য প্রেমিকের প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া জগজ্জনের চক্ষে ধাঁধা দিয়াছিল—দয়াময়ের কৃপায় সে প্রজ্জ্বলিত গগনস্পর্শী অগ্নি এব্রাহিমচক্ষে বিকশিত কমলদলে সজ্জিত উপবন, অগ্নিশিখা সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধকর গোলাপমালা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, — সে সত্য বিশ্বাসী মহাঋষি আজ কারবালা ক্ষেত্রে সমাগত। (উদ্ধার পর্ব ঃ ৪র্থ প্রবাহ)।

উদ্ধৃত অংশটি একটি দীর্ঘ প্রলম্বিত জটিল বাক্য। একাধিক উপবাক্য যোগে বাক্যটি গঠিত। সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারও রয়েছে যথেষ্ট। বেশীর ভাগই তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ বেহেশতবাসী পয়গম্বরের ভাবমূর্তি ও পরিবেশ প্রকাশ করতে আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগের অবকাশই ছিল বেশি। কিন্তু লেখক তা করেননি।

অবশ্য আরবী ফারসী শব্দযুক্ত বাক্যও তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু খুব স্বল্পক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কখনো কখনো বন্ধনীর ভেতরে কোন কোন বিদেশী শব্দের অর্থ লিখে দিয়েছেন। যেমন, —

> হাসান সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া তস্‌বি (জপমালা) হস্তে উপাসনা মন্দিরের সম্মুখে পদচালনা করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ফকির জাতীয় প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ফকিরের মলিন বেশ, শত গ্রন্থিযুক্ত পিরহান, মলিন বস্ত্রে শির আবৃত, গলায় প্রস্তরের তস্‌বি, হস্তে কাষ্ঠযষ্টি। হাসানের কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন, 'প্রভো! আমি একটি পর্বতের উপর বসিয়া ছিলাম। দেখি যে, একজন কাসেদ আসিতেছে, হঠাৎ ঈশ্বরের নাম করিয়া সেই কাসেদ ভূতলে পতিত হইল।' (মহরম পর্ব ঃ সপ্তম প্রবাহ)।

এখানে তস্‌বি, ফকির, সির, পিরহান, কাসেদ — পাঁচটি আরবী ফারসী শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

'বিষাদসিন্ধু'তে তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও প্রচুর দেখা যায়। এমন কি কথ্যভাষার শব্দও প্রয়োগ করেছেন — কখনো বর্ণনায়, কখনো কথোপকথনে। যেমন বর্ণনার একটি অংশ ঃ

> এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। চক্ষের বাঁধা ছুটিয়া গেল। প্রাণ চমকিয়া উঠিল। (মহরমপর্ব ঃ ২৩শ প্রবাহ, পৃ. ৯৭)।

সংলাপের একটি অংশ ঃ

> সে কথা আর কি বলিব। আমার কপাল মন্দ, আমার চক্ষে পড়িবে কেন ? সারাটি দিন আর এই রাত্রির এক প্রহর পর্যন্ত কত গলি-পথ, কত বড় রাস্তার দোধারী ঘরের কোণের আড়ালের মধ্যে, কত ভাঙ্গা বাড়ীর বাহিরে ভিতরে, কত স্থান খুঁজিলাম। আমার এ পোড়া অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে কেন ? (মহরমপর্ব ঃ ২৩শ প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তে বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় লেখক বৈচিত্র্যের অনুসারী। এই বাক্য নির্মাণে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

প্রথমত, গদ্যে বাক্যের কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদের অবস্থানের রীতিটিকেই তিনি প্রধানভাবে আশ্রয় করেছেন। রীতি বিচারে তাই এটি সরল গদ্য রীতি।[৩৩] ভাষা সুললিত এবং প্রাঞ্জল। এই সরলরীতির বাক্যেই তিনি ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন—

> রোগীর পথ্য লইয়া জয়নাব সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জায়েদা আড়নয়নে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মায়মুনাও হাসনেবানুর সাড়া পাইয়া আস্তে আস্তে গৃহ ত্যাগ করিল। (মহরমপর্ব ঃ ১৫শ প্রবাহ)।

আবার কখনো ক্রিয়াপদ উহ্য রেখে বাক্যের রূপ পরিবর্তন করে চিত্রগুণ সৃষ্টিতেও সক্ষম। যেমন—

> যুদ্ধকাণ্ড বড়ই কঠিন। সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে সর্বস্ব বিনাশ। লক্ষ প্রাণীর প্রাণ মুহূর্তে ধ্বংস ?

বড়ই কঠিন ব্যাপার! দামেস্ক রাজ্যের যে সময় উপস্থিত, এ সময় যুদ্ধ করাই অন্যায়। (এজিদবধ পর্ব ঃ ১ম প্রবাহ)।

এছাড়াও কখনো অসমাপিকা ক্রিয়াপদের উপস্থাপনার কৌশলও গদ্যকে গতি ও প্রাণ দান করেছে।

প্রশ্নবোধক বাক্যকে পর পর সাজিয়ে একটি চিত্রকে জীবন্ত ও চলমান করে তোলা মশাররফের একটি প্রিয় বিষয়। সমগ্র 'বিষাদসিন্ধু'তে এই রীতি ছড়িয়ে আছে। একটি দৃষ্টান্ত,

সীমার নাই ? আমার চিরহিতৈষী সীমার নাই ? মহাবীর সীমার ইহজগতে নাই ? হায় ! যে বীরের পদভরে কারবালা প্রান্তর কাঁপিয়াছে, যাহার অস্ত্রের তেজে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, হোসেন-শির দামেস্কে আসিয়াছে, সেই সীমার নাই ? কে তাহার প্রাণ হরণ করিল ? (উদ্ধার পর্ব ঃ ২০শ প্রবাহ)।

সম্বোধন করে বলা 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সম্বোধনে কৌতূহলের যেমন প্রকাশ আছে, তেমনি আছে নাটকীয় গতিবেগ ও দ্যোতনা সৃষ্টির ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্রের উদ্দেশ্যে লেখকের বক্তব্য। যেমন,

সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি ? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল ? তুমি ত আর জয়নাবের রূপে মোহিত হইয়াছিলে না ? (উদ্ধার পর্ব ঃ ২য় প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তে মীর উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে যেমন কথা বলেন তেমনি পাঠককেও তাঁর সঙ্গী করে নেন। পাঠককে সম্বোধন করে ঘটনাটি তার সামনে শুধু দৃশ্যমান করে তোলেন না, পাঠককেও সেই ঘটনার সাক্ষী করে তোলেন। পাঠককে সম্বোধন করে বলার এই রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হোমারের ইলিয়াদেও এই রীতি দেখা যায়।[২৪] সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে মীর প্রচলিত রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন, এজিদ বধ পর্বের প্রথম প্রবাহে এজিদের পরাজয়ের একটি দৃশ্যে পাঠকদের জানাচ্ছেন ঃ

পাঠক! চুপি চুপি কথা আর কিছু নহে, আমাদের জানা কথা– গত কথা, যুদ্ধের বিবরণ এবং এজিদের পলায়ন, এই সংবাদ।

চলুন, অন্যদিকে যাওয়া যাক। শুনিতেছেন ? শুনিতে পাইতেছেন ? স্ত্রী-কণ্ঠ। বুঝিতে পারিতেছেন ? কি কথা, একটু অগ্রসর হইয়া শুনুন।

কোন কোন সময় এই গ্রন্থে ক্ষুদ্র বাক্য থেকে ক্রমশঃ দীর্ঘ বাক্য পর পর গ্রথিত করে ভাবনা, কল্পনা কিংবা অনুভূতি প্রকাশ করবার পদ্ধতি লেখক অবলম্বন করেছেন।

আশা মিটিবার নহে। মানুষের মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত হইতে শেষ পর্যন্ত অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া, অনেকে পথে অপথে ছুটিয়া বেড়ায়। (এজিদ বধপর্ব ঃ ৪র্থ প্রবাহ)।

অথবা,

রে পথিক! রে পাষানহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ ? (উদ্ধার পর্ব ঃ ২য় প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তে ধ্বনিঝঙ্কৃত, গতিশীল এবং ছন্দোময় বাক্যে যুদ্ধের মেজাজ, যোদ্ধার রণোন্মত্ততা এবং ঘটনার দ্রুততা পরিস্ফুট হয়েছে। এক্ষেত্রে বাক্যগুলি ছোট ছোট। এজিদের প্রতিপক্ষ জনৈক গাজী রহমানের কথোপকথনে সেই সুরেলা ধ্বনিঝঙ্কার ঃ

> ভ্রাতৃগণ! চিন্তা কি ? সাজ সমরে! বন্ধুগণ ! সাজ সমরে – বাজাও ডঙ্কা, – উড়াও নিশান, – ধর তরবারি – ভাঙ্গ শিশির – মার এজিদ্ – চল নগরে – দাও আগুন, পুড়ুক দামেস্ক। (উদ্ধার পর্ব ঃ ২৬শ প্রবাহ)।

মীর মশাররফ জীবনের ছোট বড় প্রতিটি ঘটনার ওপর সমান মনোযোগ অর্পণ করেন, কথা বলেন অনেকটা জায়গা জুড়ে। মীরের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বাক্যরচনা পদ্ধতিকে জনৈক সমালোচক পারাতাক্সিস রীতি বলেছেন।[২৫] এই রীতিতে পৃথক পৃথক বক্তব্য পর পর বিন্যস্ত হয়। 'বিষাদসিন্ধু'র একটি দৃষ্টান্ত ঃ

> ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ, শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ। (মহরম পর্ব ঃ ১২শ প্রবাহ)।

এখানে 'শেষ' শব্দটির একবার প্রয়োগ থাকলেও চলত। কিন্তু শব্দটিকে লেখক বার বার ফিরিয়ে এনে ঋণ, অগ্নি, ব্যাধি ও শত্রু সকলকেই পৃথকত্ব ও গুরুত্ব দিয়েছেন।

সুষম যতি-বিন্যাস গদ্যের মূল ধর্ম নয়। কিন্তু গদ্যে দেখা যায় ঃ

> In prose the rhythmic pattern is much less marked. Rhyme and metre are not used, though alliteration frequently in, but rhythm is present to a greater or lesser degree.[২৬]

তাছাড়া,

> Prose rhythm is a matter of Emphasis, it is putting the important words where they sound important. It is a matter of coherence; it is putting the right idea in the right place.[২৭]

বলা বাহুল্য, এই ছন্দোবদ্ধ গদ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে প্রতিভাসিত। যদিও তার কোন পরিমাপ বা সুনিয়মিততা নেই। প্রকৃতপক্ষে তাই, অনিয়মই গদ্যের ছন্দস্পন্দ।[২৮] মশাররফ 'বিষাদসিন্ধু'র গদ্যে অসমমাত্রিক বিন্যাসে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি উদাহরণই যথেষ্ট ঃ

> উভয় দলই উষা-দেবীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। ক্রমে প্রদীপ্ত দীপশিখার তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল— ঘোর অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ুর সহিত ক্ষণস্থায়ী উষাদেবী ধবল বসনে ঘোমটা টানিয়া, পূর্বদিক হইতে রজনীদেবীকে সরাইয়া সরাইয়া দিনমণির আগমন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। উভয় দলই পরস্পরের চক্ষে পড়িল। (উদ্ধার পর্ব ঃ ১১শ প্রবাহ)।

'বিষাদসিন্ধু'তেও মশাররফ বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গের বিভক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন – 'হাসনেবানু হাসানের প্রধানা স্ত্রী সকলের মাননীয়া' (বিষাদসিন্ধু, পৃ. ২৫), 'জায়েদা যেন স্বামীর বন্দিনী। প্রাণবিনাশিনী বলিয়া অপরাধিনী' (পৃ.৭২), 'জায়েদা রজতাসনে আসীনা, মায়মুনা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ঠা।' (পৃ. ৭২) প্রভৃতি।

এ গ্রন্থে মীরের বাগ্‌ভঙ্গিমাও প্রশংসনীয়। ভাবপ্রকাশ করতে অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন –

যমক — জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন। (মহরমপর্ব ঃ ১৫শ প্রবাহ, পৃ. ১৩০)।

রূপক — এজিদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেল। (উদ্ধারপর্ব ঃ ৩০ প্রবাহ, পৃ. ২৪৬)।

ব্যতিরেক — প্রস্ফূটিত গোলাপদল বিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদন মণ্ডলের আভা . . .। (মহরম পর্বঃ ৬ষ্ঠ প্রবাহ, পৃ. ২১)।

সমাসোক্তি — স্বার্থপ্রসবিনী গর্ভবতী আশা যতদিন সন্তান প্রসব না করে, ততদিন আশাজীবী লোকের প্রশংসিত মানসাকাশে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না। (মহরম পর্ব ঃ ২৩শ প্রবাহ, পৃ. ৮৭)।

চিত্রকল্প নির্মাণেও তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। 'বিষাদসিন্ধু'র সমগ্র কাহিনীর পরিণাম-জ্ঞাপক বর্ণনায় এর পরিচয় আছে।

> এখন আর সূর্য নাই। পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। (এজিদবধপর্ব ঃ ৫ম প্রবাহ, পৃ. ২৭৯)।

অবশ্য মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনায় কখনো কখনো একই শব্দের বহু ব্যাখ্যানির্ভর সমান্তরাল গঠনের বাক্যরচনা মনে হয় গদ্যের পক্ষে ভার হয়ে উঠেছে। তার স্বাভাবিক গতিময়তা ও সৌন্দর্য যেন তাতে ক্ষুন্ন হয়। যেমন, উদ্ধার পর্বের ২১শ পরিচ্ছেদের প্রথমে দুরাশা শব্দটিকে একাধিক উপমানের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন।

তবু 'বিষাদসিন্ধু'র এই ভাষা সম্পদের জন্যেই গ্রন্থটি সমকালে সাহিত্যিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'চারুবার্ত্তা' লিখেছিল ঃ

> ইনি যেরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন অনেক শিক্ষিত হিন্দু তেমন লিখিতে পারেন না।[২৯]

'বঙ্গবাসী'ও (২৭ বৈশাখ ১২৯২) মন্তব্য করে ঃ

> যেরূপ সুন্দর, সুললিত, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাদুর বলিতে হয়।[৩০]

সুলভ সমাচার, ঢাকা প্রকাশ, ভারতী[৩১] প্রভৃতি পত্রিকাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করে এর ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষা প্রসঙ্গে গদ্যশিল্পী মীরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একালের সমালোচক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্যটি করেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> মীর সাহেব একজন সার্থক গদ্যশিল্পী। আজ থেকে এক'শ বছর আগে তিনি গদ্যবাহনকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী চালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বীররস, করুণরস, শৃঙ্গাররস, ভয়ানকরস–

সবেতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। পরম্পরিত বাক্যরচনায় ও তার সমতা রক্ষায় মীর সাহেবের নৈপুণ্য অবশ্য স্বীকার্য। বিবরণাত্মক গদ্য, আবেগপূর্ণ গদ্য, যুক্তিপূর্ণ গদ্য ও গূঢ় মনোভাব প্রকাশক গদ্য রচনায় মীর সাহেবের কৃতিত্ব . . . অনায়াস লক্ষণীয়।[৩২]

উদাসীন পথিকের মনের কথা

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র গদ্যরীতি 'বিষাদসিন্ধু'র গদ্যের মতো উজ্জ্বল ও অলংকারময় নয়। এর কাহিনীর বুনন যেমন শিথিল তেমনি এর ভাষাভঙ্গিও অনেকটা সরল হয়ে এসেছে। 'রত্নবতী' এবং 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষা ছিল আলঙ্কারিক। সেখানে তিনি তৎসম শব্দবহুল বিশুদ্ধ বাক্য রচনা করেছেন। আলঙ্কারিক রীতি প্রয়োগ করে ভাষাকে আবেগ প্রকাশের বাহন করে তুলেছেন। কিন্তু 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দেখতে পাই তাঁর গদ্যে পূর্বের গুরু গম্ভীরভাব অনেকটা সরে গিয়ে হয়ে উঠেছে অনেক সরল এবং আন্তরিক। এখানে তৎসম শব্দের ব্যবহার কমেছে, যদিও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ খুব বেশি হয়নি। বিশেষত যেখানে সাধুরীতির গদ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া আরবী ফারসী শব্দও কম। কথ্য ভাষাভঙ্গি এবং সেইসূত্রে কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

তৎসম শব্দ-কেন্দ্রিক তাঁর রচনাভঙ্গির মধ্যেও অপরূপ মোহনীয়তা অনুভব করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত ঃ

> কালিগঙ্গার পশ্চিমপারেও ঐ রূপ আলো, ঐ প্রকার বিকট রব, – মাঝে মাঝে ভয়ানক চিৎকার, – দেখিতে দেখিতে কালিগঙ্গার পশ্চিমতট আলোক মালায় পরিশোভিত হইল–জলে স্থলে জ্বলন্ত মশালের শিখা অধো উর্দ্ধভাবে প্রভাতবায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য!! সে সুদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। ঊষাদেবী পূর্ব্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। (দ্বাদশ-তরঙ্গ/ মশাররফ রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮)।

এ রকম তৎসম শব্দ-নির্ভর গদ্য 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় খুব বেশি নেই। তদ্ভব শব্দের আশ্রয়ে ও সহজ সরল মৌখিক ভাষায় লেখা গদ্যেরই প্রাধান্য। যদিও সমগ্র গ্রন্থটি সাধু ভাষায় লিখিত।

আঞ্চলিক ভাষার কিছু শব্দ এই গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণতঃ সাহিত্যিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন 'বাঁধা'র স্থানে 'বান্দা', 'অন্ধকার' স্থানে 'আন্ধার', কাঁদা স্থানে 'কান্দা' প্রভৃতি। মনে হয় উপভাষার শব্দ তাঁর শ্রবণ ও বাচন থেকে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। এর ফলে আলংকারিক গদ্যভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনায় তাঁর এই সব লেখায় লোকজীবনের ভাষার জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক নির্মাণ হিসেবে তাঁর গদ্যের শ্রী যত গুরুত্বপূর্ণই হোক এই শ্রেণীর গদ্যের ভাষার প্রাণধর্মে এ ধরণের সাহিত্যিক রচনাগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতা তাঁর পরবর্তী রচনা 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী' ও আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটিতেও লক্ষ করা যায়। জনৈক সমালোচনক একে 'পূর্ববঙ্গীয় লক্ষণ' বলেছেন।[৩৩] মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল একে 'বাধক্যজনিত কারণ' ও লেখকের 'অমনোযোগিতা'র ফল বলে মনে করেছেন।[৩৪] আমাদের মনে হয়, কথোপকথনে এই আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন—

> কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে বাবা! আমার ঐ একটী ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করেছি। ভিক্ষা করে,—নিজে পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মানুষ করিছি। ওর বয়স যখন সাড়ে চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কল্‌জে ফেটে যায়, এই সাহেবই তার হাত, পা টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা। যে বিছানায় পলো, আর উঠে বসলোনা। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাস খানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুট মুখের কথা কয়ে দেলসা দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না।" (অষ্টম তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮)।

অথবা,

> প্রথম প্রজা॥ ভায়া। যা হবার হয়েছে। এখন দেখে শুনে, ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, একটুকু যেন শক্ত হয়েছি। আর এ কয়েক দিনে দেখলেম অনেক শুনলেমও অনেক। ধাঁদা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয় সে জ্ঞানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া রাজার ভাবই ভিন্ন। (৩০শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯)।

বাক্যগঠন সাধু গদ্যে। তবে এক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। একই অনুচ্ছেদে তিনি কখন দীর্ঘ জটিল বাক্য আবার কখন ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন। এইভাবে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে গদ্যকে নানা ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিলে তাঁর গদ্যের এই তরঙ্গায়িত রূপটি পরিষ্কার হবে। যেমন–

> যে জামাই শত হস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামের উপর সেলাম বাজাইয়া শ্বশুরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শ্বশুরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারী হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উল্টাইয়া সজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্দুক। সেলাম আলায়কুমের নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাইবাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নীরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে। আজ কে মীর সাহেবকে মান্য করে? সর্দ্দার, লাঠিয়াল এবং অন্য অন্য আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীর সাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না। (২৫শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড পৃ.৫৫৩)।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে "যে জামাই .... দণ্ডায়মান" এই দীর্ঘ জটিল বাক্য যেমন রয়েছে তেমনি তারপরেই "চাকরের হস্তে বন্দুক। .... মান্য করে ?" এইগুলি ছোট ছোট বাক্যও রয়েছে। আবার পরক্ষণেই "সর্দ্দার ... উঠিলনা" দীর্ঘ বাক্যটি দিয়ে অনুচ্ছেদ শেষ করা হয়েছে। এইভাবে তিনি একই অনুচ্ছেদে নানা বাক্য গঠনে যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমনি গদ্যের মধ্যে একটা ছন্দের দোলা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

'রত্নবতী' ও 'বিষাদসিন্ধু'র মতো 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়ও স্ত্রীলিঙ্গের ক্রিয়া বা বিশেষণে বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'রত্নবতী' এবং 'বিষাদসিন্ধু'র মতো এ গ্রন্থেও মশাররফ পাঠকদের সম্বোধন করে আলাপচারিতার ঢঙে কথোপকথন, নাটকীয় কৌতূহল তৈরি করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পরবর্তী ঘটনার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেছেন। যেমন—

> পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত ম্যাজিষ্ট্রেট। (দ্বাদশ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮)।

অথবা,

> পাঠক! বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। (পঞ্চদশ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৫)।

অথবা,

> পাঠক! প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইয়া অন্য কথা আরম্ভ হইল। (চতুর্দশ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯)।

এই গ্রন্থে মীরের গদ্য সহজ সরল অথচ কখনো কখনো তার মধ্যে সঙ্গীতময়তা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা বেশ অনুভব করা যায়। পরিবেশ-সৃষ্টিতে সেই ভাষাও বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে। যেমন—

> শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতবায়ু জানালার খড়খড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার রেসমী বসন সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। (ষষ্ঠ তরঙ্গ)।

এই ভাষার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত মাঝে মাঝে অনুরণিত হয়েছে। এই ধারাই পরবর্তীকালে 'গাজীমিয়ার বস্তানী'তে তীক্ষ্ণ ও সার্থকতামণ্ডিত হয়। যেমন—

> সকল কাজেই ব্যস্ততা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুন দিতে খুব পটু। ধরিতে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লম্ফে ঝম্ফে খুব মজবুত। (৩২শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, ৫৭১)।

অথবা,

> নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে সুবিধা সুযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কুঠীমুখে ছুটিল। ছুটিল কি ? পালাইল। (২৮শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৮)।

প্রাঞ্জলভাবে আলংকারিক ভাষা প্রয়োগেও তাঁর নৈপুণ্য অতুলনীয়। সাধারণ বক্তব্যও যেন ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে। যেমন—

> নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ু সহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজান ছুটিয়া চলিল। মীর সাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন। (১৫শ তরঙ্গ/১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩)।

উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগে এবং চিত্রকল্প নির্মাণের মধ্যে দিয়েও তাঁর দক্ষতা লক্ষ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণেই সেই পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন—

উপমা কমলমুখীর কমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের সুখবোধ স্থানে বার বার চুম্বন করিলেন। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৯)।

রূপক বিপদসাগরের একমাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪-৯৫)।

সমাসোক্তি শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্য পথে মিটি মিটি চাহিয়া যাইতে লাগিল। (১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪)।

চিত্রকল্প মশালের আলো মলিন হইয়া মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৯০)।

গাজীমিয়াঁর বস্তানী

মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যচর্চার এক নতুন রূপ পাওয়া গেল 'গাজীমিয়ার বস্তানী'তে। তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ বিশেষত 'রত্নবতী' ও বিষাদসিন্ধু' থেকে এই গ্রন্থের ভাষার একটা স্পষ্ট তফাৎ তৈরি হয়ে গেছে। আগে তাঁর ভাষায় সাধুরীতির যে ব্যবহার ছিল তা মূলত গুরু-গম্ভীর এবং দৈনন্দিন জীবনের ঊর্দ্ধে সাহিত্যিক আদর্শলোকে তার স্থান। কিন্তু 'বস্তানী'র ভাষা শুধু সরল সাধুভাষায় রচিত নয়, কথোপকথনের ভাষায় আছে মূলতঃ কথ্যরীতির প্রয়োগ। এ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের চলমানতা ও ভাব-ভাবনাকে রূপদানে সমর্থ হয়েছে। হয়তো এ কারণে জনৈক সমালোচক বলেন-– "চলতি গদ্যের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থটি মীর মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করে রাখবে তা হচ্ছে 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'।"[৩৫]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে প্রচলিত আরবী, ফারসী, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন দরখাস্ত, মঞ্জুর, উকিল, মোক্তার, আমলা ইত্যাদি আরবী ফারসী শব্দ এবং কোর্ট, পুলিশ, ইন্সপেক্টার, জজ, ডিসমিস ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়—

১. দশ হাজারী লোকও হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে – সদরআলা, জজ, ডিপুটী, মুনসীফ, উকীল, বড় বড় পায়াদার হাকিমের ঘরেও পর্দ্দার ব্যবহার অতি কম। (১ম নথি/ ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০-১১)।

২. সেরী পোর্ট, সেম্পীন-ক্লারেট, লিমনেড, সোডা ঠাণ্ডা জলে ঠাণ্ডা করিতে ডজন ডজন ডুবিয়ে রাখা হইয়াছে। খানসামা, আরদালী, দরবান, বেয়ারাও আয়া – বয়দিগকে দস্তুরমত পাগড়ি, চাপরাস, পেটি বাঁধিয়া – নুতন উর্দ্দী পরিয়া আপন আপন কাজ-কর্ম্ম করিতে হুকুম হইয়াছে। (৩য় নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪)।

এছাড়া এদেশের হিন্দী উর্দু ভাষার কিছু শব্দ ও বাচন-ভঙ্গির প্রয়োগ এতে দেখা যায়। যেমন – বেগম সাহেবার 'মনের কথা'র একাংশ এরূপ ঃ

হা বদ্‌বখত! বদ্‌বখত কম নছিব। জালেম! বেওফা কমিন, কমজাত, নিমক হারাম। (ষষ্ঠ নথি/ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮)।

আসলে সেকালের একটি প্রবণতার রূপচিত্রণ ঘটাতে এ ধরণের ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করতে হয়েছে। কেননা উনিশ শতকে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর লোকের মধ্যে উর্দুর ব্যবহার ছিল।

পূর্বেই বলেছি, 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও সংলাপের ক্ষেত্রে কথ্যরীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সে কারণে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেছিলেন, 'বস্তানী' 'মফঃস্বলের ভাষায়' লিখিত।[৩৬] যেমন – সোনাবিবি ও

বউ-এর কথোপকথনের একটি অংশ এরূপ ঃ

বউ। – সে কি কথা। বোধ হয়, তিনি খুব চাপা।

সোনা। – চাপা নয়, খুব হাবা।

বউ। – সেও ভাল। তার দুঃখ সে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না, গুমরে গুমরে মরতে থাকে, সে যে ভারি জ্বালা। তিনি দেখতে শুনতে খুব ভাল শুনেছি।

সোনা। – দেখতে খুব ফরসা, শুনতে কিছুই নয়। কাপড় চোপড় পরিয়ে বসিয়ে রাখ, ঠিক যেন একটা মাটির পুতুল। আচ্ছা বউ, আর একটা কথা মনে হলো, – বলবে কিনা ?

বউ। – যা বলার কথা, তা অবশ্য বলবো। কখনই মিছে বলবো না। যে কথা বলতে পারবো না অথচ শুনে অবশ্যই বলবো, এ কথার উত্তর আমি জানি, বলবো না– বলতে পারি না। মিছে কথার ধার ধারি না। (অষ্টাদশ নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০০)।

এরূপ চলতি ভাষার ব্যবহার করে মীর মশাররফ তাঁর পূর্বের রচনাগুলির গদ্যভাষা থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, বঙ্কিম-যুগে থেকেও তিনি এই চলিত ভাষা ব্যবহারের দিকে এগোতে পেরেছেন এটি তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করতে একই অর্থবোধক বিচিত্র শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বাক্যগঠন করেছেন। যেমন –

বড় মানুষের মন বড় ভয়ানক। কাজের সময় তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জান, কাজ ফুরালে পিটটান। অধিকন্তু লবেজান, হয়রান, পেরেসান, আন্‌চান। মেজাজ খারাপ। (চতুর্থ নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১)।

এই রকম অনুপ্রাস-ধ্বনিত শব্দ-প্রয়োগের মধ্যদিয়ে তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য প্রকাশ করেন, তেমনি তৈরী হয়ে যায় ছোট ছোট উপবাক্য। বাক্যও গতিশীল হয়ে ওঠে। আর একটি উদাহরণ—

প্রথম ঝুপঝাপ, তারপরে টুপটাপ, তারপরে চুপচাপ— তারপরেই কাপকাপ, ঘোপঘাপ, তারপর ধরাধরি, ঝক্‌মারি, সর্ব্বশেষে দাগাদারী। (অষ্টাদশ নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০১)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "ঈশ্বরগুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরচন্দ্র Satirist।"[৩৭] 'গাজীমিয়ার বস্তানী'র লেখক মীর মশাররফ সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। কেননা মীর এখানে সেকালের সমাজের কুৎসিৎ রূপকে যেমন এঁকেছেন তেমনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করে সমাজ সংশোধনের চেষ্টাও করেছেন। এক্ষেত্রে 'বস্তানী'র ভাষা রঙ্গব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা প্রকাশে সমর্থ হয়েছে। অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ একান্ত নিভৃতে বেগম সাহেবার যে স্তুতি করেছেন তাতে লেখকের ব্যঙ্গ গোপন থাকেনি ঃ

ধন্য ধন্য! সাধ্য নাই এরূপ শিক্ষায় এরূপ ব্যবহারে কোন মুসলমান মাথা তুলিয়া দুটি কথা আপনার বিরুদ্ধে বলতে পারে ? ধন্য ধন্য মেহমুডেন লেডী! এত উন্নত! ধন্য ধন্য পাড়াগাঁয়ের পর্দ্দানসীন জানানা। এত উন্নত! (তৃতীয় নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮)।

আবার সোনাবিবি ও মনিবিবির লোকেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে লেখকের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিও দেখা যায়। যেমন—

> . . . মণিবিবির পক্ষের লোকেরা পুলিসের সম্মুখে দিনে দুপোরে ডাকাতি করিল। পুলিস নিবারণ করা দূরে থাকুক, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, চক্ষেই যেন দৃষ্টি হইল না, কথাও সরিল না। ধন্য বিচার! ধন্য শান্তিরক্ষা! ধন্যরে পুলিস! ধন্যরে হাকিমের হুকুম। (অষ্টম নথি/৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২)

এইভাবে 'বস্তানী'তে নানা স্থলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তাঁর ভাষা ভঙ্গিরও পার্থক্য সূচিত হয়ে গেছে। পূর্বের 'অলঙ্কৃত শোভনতা'র বদলে দেখা গেছে নিরলঙ্কৃত বাচ্যতা। জনৈক সমালোচক তাই বলেছেন,

> এক প্রান্তে সাধুরীতির সুশৃঙ্খল বিন্যাসে প্রদীপ্ত 'বিষাদসিন্ধু', অন্যপ্রান্তে চলিতরীতির বিচক্ষণ সচলতায় 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'। উভয় রীতিতেই তিনি সমভাবে সফলকাম ছিলেন। 'বিষাদসিন্ধু'তে নিরূপিত ও সুশৃঙ্খল অন্বয় বন্ধনে একটি আবেগময় ভাষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'তে চটুল কথকতায় সাধারণ জীবনের উজ্জীবন ঘটেছে।[৩৮]

অবশ্য এই প্রশংসার পাশাপাশি সেকালে 'বস্তানী'র ভাষার সমালোচনাও হয়েছিল। 'ক্যালকাটা গেজেট' লেখকের বাংলা ভাষায় দখলের প্রশংসা করেও লিখেছিল ঃ

> The writer though a Muhammedan writes Bengali with ease and possess a wonderful command over the vocabulary of the language. But his style is nevertheless ungrammatical and marked by East Bengalism and an absence of literary grace.[৩৯]

কিন্তু এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঠিকই বলেছেন,

> তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধা বিঘ্ন ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মসারফ হোসেন যে সাহিত্যশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।[৪০]

আমাদের বিবেচনায় 'বস্তানী'তে মশাররফ কথ্যভাষাকে যেভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অন্যান্য ভাব প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন তা কোথাও কৃত্রিম হয় নি। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের গদ্যরীতির ভঙ্গিতে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। সেদিক থেকে 'বস্তানী'র গদ্যভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার জীবনী

মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'র "মাননীয় পাঠকগণ সমীপে" অংশে এর ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমার জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে।" এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত শব্দসমূহ "যেমন প্রচলিত আছে, সেই রূপই প্রকাশ করিব"।[৪১] বলাই বাহুল্য মীরের এই সচেতনতার ফলস্বরূপ দেখা যায়, এর ভাষা সাবলীল ও গতিময়। পূর্বের 'বিষাদসিন্ধু'র শাব্দিক পরিবেশে ছিল ধ্বনি গাম্ভীর্য এবং গুরু গম্ভীর ভাব। কোথাও কোথাও তরল ধ্বনিযুক্ত সুললিত

শব্দের দ্বারা হালকা পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও 'বিষাদসিন্ধু'তে যেন স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে পাঠকের একটা আড়াল থেকেই যায়। কিন্তু এই আত্মজীবনীতে তা হয়নি।[৪২] আটপৌরে জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি আটপৌরে পরিচিত শব্দই ব্যবহার করেছেন। ভাষাও হয়েছে অনাড়ম্বর ও আড়ষ্টতাহীন। সাধুভাষায় রচিত হয়েও গদ্যভঙ্গি হয়েছে সরল। প্রয়োজন অনুযায়ী বেশ কিছু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারও তিনি করেছেন। বিষয় ও ভাবের পরিবর্তন অনুযায়ী তাঁর গদ্যভঙ্গিরও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

'আমার জীবনী'র ভাষা সাধু গদ্যরীতির হয়েও চলিত রীতির আমেজ মাখা। বাক্যগুলিও ছোট ছোট। বর্ণনা ভঙ্গি সহজ অথচ গতিশীল। যেমন—

> মাষ্টারবাবু কেবল ইংরেজী পড়াইতেন। গান গাইতে জানিতেন। শিক্ষিত গায়ক ছিলেন। গলাটাও মিষ্টি ছিল। বাঙ্গালা টপ্পা গান অনেক জানিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কিছুই নহে। আমাদের মধ্যেই নহেন। নবাবের বাটী হইতে স্কুল আধ ক্রোশের কিছু কম। স্কুল ঘরেই তাঁহাদের বাসা। স্কুল ঘর বৃহৎ আটচালা। পাকা সান পেটা। চারদিকে পাকা গাথনির দেয়াল, চুনকাম করা। উপরে উলুখড়ের ভাল ছাউনি। ঘরটি যেমনি বৃহৎ, তেমনি পরিষ্কার।[৪৩]

আবার আবেগ অনুভূতি প্রকাশেও এর গদ্য উপযোগী হয়ে উঠেছে। এই গদ্য যেমন চিত্রধর্মী তেমনি কাব্যময়। তৎসম শব্দকে তিনি সেখানে বেশি আশ্রয় করেছেন। কিন্তু গীতল ভাষাভঙ্গিতে তা সচল ও চিত্তাকর্ষক। যেমন—

> ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, চক্ষে চক্ষে মিলিল—চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অঙ্কিত ছায়া, নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দর্পণ মধ্যস্থিত যুবতীর চক্ষু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর লাল হইয়াছে। সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়া শ্যামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ঈষৎ লোহিত অধর ওষ্ঠে হাসি নাই। বিস্ফারিত জোড়া ভুরুযুক্ত চক্ষে আনন্দের চিহ্ন নাই। . . . প্রতীমাঘরের দেবীদিগের চক্ষু ভাব যেরূপ, স্থির ধীর। এও সেই প্রকার। আমি আমার হৃদয় প্রতিমা দেখিতেছি।[৪৪]

এইভাবে কখনো ঘটনা বর্ণনায়, কখনো দৃশ্যবর্ণনায় আবার কখনো আত্মগত ভাব পরিবেশনায় এর গদ্যভঙ্গি বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আধুনিক গদ্যভঙ্গির দিকে বিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেন—"এর ভাষা আধুনিক, চিত্রধর্মী ও জীবন-ঘনিষ্ঠ।"[৪৫]

পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মতো 'আমার জীবনী'তেও পাঠককে সম্বোধন করে কথোপকথন বা উপস্থাপন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন —"এই পর্য্যন্তই কথা শেষ। প্রিয় পাঠকগণ। . . .।", "পাঠক! সেই মহাতাপস সাহ সৈয়দ সাদুল্লার পৌত্র সাহ সৈয়দ মীর কুতবুল্লা।", "পাঠক! সে সময়ের কথা . . . .।", "প্রিয় পাঠক গণ ! আমি কে ? প্রকাশ্য সম্পর্কে আমি কাহার কে, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন। এইক্ষণ স্থির ধীরভাবে আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনুন।"[৪৬] প্রভৃতি। এ ছাড়া এ গ্রন্থে কথক মাতামহীর বলবার ভঙ্গিটিও লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি।

এ গ্রন্থে লেখক অলঙ্কার প্রয়োগেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। উপমা, রূপক, সন্দেহ প্রভৃতি অলঙ্কার তিনি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো সেই উপমানের বস্তুগুলিও সাদামাটা গ্রাম্য জগত থেকে চয়ন করা। যেমন—

উপমা ঃ মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার মত।[৪৭]

উৎপ্রেক্ষা ঃ স্বামী যেন একটা গাবগাছের ভূত।

অথবা, পতি প্রাণধন যেন গুবরে পোকা।[৪৮]

সন্দেহ ঃ গৌরী কি মানুষ ? না দেবী ?[৪৯]

অবশ্য এই রচনার কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয় বা বাক্যের পুনরুক্তি লক্ষ করা যায়। এটি যে কোন সচেতন গদ্য শিল্পীর পক্ষেই অনভিপ্রেত। তবু বলা যায়, 'আমার জীবনী'তে লেখকের গদ্যশৈলীর বিবর্তন ঘটেছে এবং "... বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্ডিত হতে পেরেছে ততটাই আমাদের চিত্ত জয় করেছে।"[৫০] তাই এর গদ্যভঙ্গি সেকালের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

বিবি কুলসুম

'বিবি কুলসুম'-এর ভাষা বেশ সুখপাঠ্য। সরল সাধু ভাষায় রচিত। 'আমার জীবনী'র মতো ভাষা এখানে সহজ এবং প্রাঞ্জল। এখানকার ভাষাও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কখনো আবেগময় কাব্যিকভাষা, কখনো নাটকীয় ভাব-প্রকাশক গদ্যভাষা আবার কখনো বা যথার্থ বর্ণনার ভাষা। বর্ণনার ভাষায় সাধুভাষার আদল থাকলেও আটপৌরে চলতি ভাষারই আবেশ মাখানো। একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ঃ

> সেই হইতে আমি কোন সভা সমিতিতে যাই নাই। কারণ কুলসুম বিবির কথাটা আমার লাগিয়াছিল। যাহাদের ঘরে তণ্ডুল নাই তাহাদের আবার সভা সমিতি কি ? পেটের চিন্তায় যে পাগল যেমন তেমন লোক নহে। . . . দুবেলা উপহাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিত সাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিম ভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।[৫১]

এখানকার ভাষা সাধু হলেও সহজ এবং মৌখিক ভাষারই কাছাকাছি। আবার তিনি আবেগ মণ্ডিত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে তাঁর গদ্যকে উপযোগী করে তুলেছেন। সেখানে কখনো কখনো তাঁর নিজস্ব ঢঙে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাক্য-পরম্পরা সাজিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এ রীতি 'বিষাদসিন্ধু'তেও দেখা গেছে। যেমন—

> আমি আমার চক্ষে আমার ধারণায়, আমার বিবেচনায় যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি,—আমার বহু কালের যত্নের ধন, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্টে, বহু যন্ত্রনা যাতনা—গঞ্জনা, আত্মীয় স্বজনের বাক্যবাণ সহ্য করিয়া আমার চক্ষে অমূল্য ধন, রত্ন মাণিক যাহাই বলি, — সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আজ ৪০ বৎসর পরে তাহা হারাইয়াছি।
>
> কে হরিয়া লইল ?—না স্ব ইচ্ছায় চলিয়া গেল ?— না কেহ কোনরূপ কুহক জাল বিস্তার করিয়া, আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি না ?
>
> হরিবার সাধ্য কাহারও নাই। সর্ব্বশক্তিধর — দয়াময় জগদীশ্বর ভিন্ন তাহাকে হরিবার শক্তি এ জগতে কাহারও নাই। তাই কি সত্য?— মন যে মানেনা, মন যে তাহা বলে না।[৫২]

হৃদয়-বিস্তারী অনন্ত আবেগ প্রকাশে বাক্যও এখানে দীর্ঘ। আবার কখনো হ্রস্ব।

'আমার জীবনী'তে মীরের প্রথম প্রণয়ের বর্ণনা ছিল আবেগমণ্ডিত। এখানেও তিনি পুনরায় বিবি কুলসুমের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ও প্রণয় উপস্থাপিত করেছেন বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। এই বর্ণনা যেমন নাটকীয় তেমনি এই গদ্য সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি প্রকাশেও সক্ষম। যেমন—

> আমাদের গ্রামের দক্ষিণে মাঝিদিগের পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। ফাল্গুন মাস—বাতাসও একটানা। আগুন লাগিয়া আগুন গ্রামময় হইয়া উঠিয়াছে ..... কত লোক আর্ত্তনাদ করিয়া দৌড়িয়াছে, আগুনের তাড়না তাহার পর দুইটা ঘোড়ার তাড়ায় প্রাণের ভয়ে হতাশ হইয়া ছুটিয়াছে। আমাকে রক্ষা কর বাঁচাও বলিতেছে, দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল।
>
> সেই যে দেখিলাম—দেখিলাম, চিনিলাম, পূর্বে দেখিয়াছি, আজ ঘটনাক্রমে দেখিলাম। ঘরপোড়া আগুন দেখিতে না গেলে দেখিতাম না, ঘোড়ায় তাড়া না করিলে আমার বক্ষের মাঝে মাথা লুটাইত না। অভয় দান করিলাম। বক্ষে বক্ষে স্পর্শ হইল। সে সুখে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। ... প্রশস্ত স্বর্ণকান্তি মাঠ! সর্ব্বকুলে আচ্ছাদিত হইয়া যেন সোনার মাঠ বলিয়া প্রতীত হইতেছে- — সোনার বাঙ্গলায় সোনার মাঠ আশ্চর্য্য কি ?[৫৩]

এই গদ্য সহজ সরল অথচ সূক্ষ্ম ভাবাবেগ প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

মশাররফ আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটির পূর্বে কাব্য কবিতা রচনায় হাত দেন। কাব্য-চর্চায় তাঁর সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে গদ্যশিল্পীই তা 'বিষাদসিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'বস্তানী'র পর এই আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতে আর একবার প্রমাণিত হল।

উপন্যাস ও আত্মজীবনীমূলক রচনায় মীর মশাররফের গদ্যের বিবর্তন ঘটেছে বলা যায়। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'রত্নবতী'তে আশ্রয় ছিল শুধুই সাধু রীতির গদ্য। সেখানকার ভাষা ছিল তৎসম শব্দবহুল। 'বিষাদসিন্ধু'তে সাধুরীতির কাব্যিক ভাষা। ভাষা গুরুগম্ভীর ও আলঙ্কারিক। তবে তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার বেশ দেখা দিতে শুরু করেছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র গদ্যে বাইরে সাধুর ছাঁদ কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন কথ্যরীতির বাচনভঙ্গি। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে বর্ণনা সাধুভাষার কিন্তু কথোপকথন একেবারে চলিতের। এর সঙ্গে এখানকার গদ্যে তিনি এনেছেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশের উপযোগী কলাকৌশল ও ভাষারীতি। এরপরেই আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটিতে সাধুভাষার রীতি গৃহীত হলেও এর অভ্যন্তরে চলিত ঘরোয়া কথাবার্তার রেশই অনুভূত হয়। সুতরাং এই রচনাগুলিতে মীরের গদ্যচর্চার বিবর্তনে লক্ষ করা যায়, লেখক ক্রমশঃ সাধু গদ্য থেকে চলিতের দিকে, গুরুগম্ভীর ভাষা থেকে সহজ সরল গদ্যভঙ্গির দিকে যাত্রা করেছেন এবং বিষয় পরিস্ফুটনে ও ভাবপ্রকাশে সাফল্য লাভ করেছেন।

প্রবন্ধ জাতীয় রচনা

গো-জীবন

মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত। ভাষা যুক্তিনির্ভর ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। 'বিষাদসিন্ধু'র প্রায় সমকালে রচিত হলেও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ভিন্নতার কারণে 'গো-জীবনে'র ভাষায় সেই প্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য নেই। প্রবন্ধের

উপযোগী এর ভাষায় তেমন সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতার অভাব। তবে লেখকের নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠায় এই গদ্য বাহন হয়েছে।

মীরের গদ্যবাক্যে যেমন সুবোধ্যতার দাবি প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অনুভূতি সঞ্চারের প্রয়াসও গৌণ নয়। তাঁর এই প্রবন্ধের গদ্য সহজ সরল মসৃণতার সঙ্গে হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।[৫৪] যেমন—

> এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক–সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গি যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?[৫৫]

'গোজীবন' নীরস তর্কবিতর্কমূলক প্রবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও লেখক মাঝে মধ্যে ব্যঙ্গ কৌতুক ও শ্লেষ বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে এখানকার গদ্যও সরস বাক্‌ভঙ্গির বাহন হয়েছে। একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

> এখন পাত্র হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম! খাই গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল। বায়ু সেবন করি ঝাড় জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খড়ো ঘরে। চলাফেরা করি সেঁতসেঁতে ভিজে মাটি জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্থি, পেশীশক্তিও তথৈবচ। সাহসের ত কথাই নাই। পাকযন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আর কি বলিব। . . . দুগ্রাস বেশী গলাধ করিলেই পেট ফাঁপিয়া প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে।[৫৬]

এই ব্যঙ্গ কৌতুকের পাশাপাশি মীরের গদ্যও সরলতার দিকে এগিয়ে গেছে। সাধুরীতির গদ্য হয়েও যেন কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির প্রবাহ এর অভ্যন্তরে বিচরণ করেছে। এর ফলে এখানকার ভাষা অনেক সহজ সরল ও কথোপকথনের ভাষার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

তবে কখনো কখনো 'পাঠক' সম্বোধনে বৈঠকীরীতি অবলম্বিত হওয়ায় এবং প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে বক্তব্যকে বার বার এগিয়ে নিয়ে যাবার মীরের পরিচিত কৌশল গৃহীত হওয়ায় এই ধরণের বিতর্কমূলক প্রবন্ধের পক্ষে বেমানান হয়েছে। এছাড়া তিনি শব্দ ব্যবহারের প্রাচীন রীতি অনুসারে আঙ্কিক চিহ্ন দিয়ে শব্দদ্বিত্ব বুঝিয়েছেন, যেমন – 'ন্যায় চক্ষে তন্ন ২ করিয়া দেখিয়া' (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১), 'তাহারা গোজীবনের কোন ২ প্রস্তাবের, কোন ২ শব্দে' (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭) ইত্যাদি। রামমোহনের গদ্যে এ রীতি দেখা গেলেও বিদ্যাসাগরে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও ততদিনে গদ্যকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের রচনার পরবর্তীকালে রচিত 'গো-জীবনে' এ রীতি কাম্য নয়। হয়তো এ কারণেই 'গো-জীবন'-এর ভাষার সমালোচনা করে সে কালের জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন—গ্রন্থটি "ছন্দপতন, কর্কশ ইত্যাদি দোষে পূর্ণ রহিয়াছে।"[৫৭]

তবু স্বীকার করতেই হয় যে, মীর মশাররফ তাঁর 'গো-জীবন'-এ গদ্যকে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, তর্ক বিতর্ক ও গভীর আবেগ-অনুভূতির বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

নাটক ও প্রহসনজাতীয় রচনা

বসন্তকুমারী নাটক

উপন্যাস ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনার থেকে নাটক ও প্রহসনে ব্যবহৃত ভাষা ও রচনারীতি আলাদা। নাটকের প্রাণ হচ্ছে সংলাপ। এই সংলাপ রচনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে নাটকের সাফল্য। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর প্রথম রচনা 'রত্নবতী'র পরেই 'বসন্তকুমারী নাটক' ও 'জমীদার দর্পণ' নাটক রচনা করেন ও সংলাপ রচনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

'রত্নবতীর' মতো উপাখ্যানে তিনি গুরু গম্ভীর সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন। অথচ তার পরের গদ্যগ্রন্থ এবং প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী নাটকে' চলিতভাষা রীতির সংলাপ রচনা করে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। এতে তৎসম শব্দ-সংখ্যা কম এবং ক্রিয়াপদ চলিত। তবে রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের মুখের ভাষা চলিত হলেও তৎসম শব্দপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেছেন। লেখক ভাষা ব্যবহারের তারতম্য বিষয়েও সচেতন ছিলেন। ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রানুযায়ী সংলাপের ভাষা ব্যবহার করায় চরিত্রগুলিও বাস্তবোচিত ও সজীব হয়েছে। সেই ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য থেকেই আমাদের বুঝে নিতে সুবিধে হয় কে কোন্ শ্রেণীর চরিত্র। যেমন – রাজা যখন 'পুষ্পোদ্যান'-এ প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করছেন তখন তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি চলতি হলেও শব্দগুলি তৎসম এবং সম্বোধনও সংস্কৃত রীতি অনুসারী।

> বৎস্য! দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধু গন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে।[৫৮]

অবশ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই রাজারও সংলাপে পরিবর্তন হয়েছে। রানী রেবতীর মান ভাঙ্গাতে তাঁর প্রেমিক-হৃদয় যেমন আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা নয়, তেমনি ভাষাও হয়েছে সহজ এবং তদ্ভব-প্রধান। যেমন–

> প্রিয়ে! তোমার পায় ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত যাবে, তাহলে পত্র নেওয়া দূরে থাক্ ছুঁতুমও না। পায় ধরি – নেও, আর মনে ব্যথা দিও না।[৫৯]

রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের পাশাপাশি সাধারণ প্রজা, গ্রাম্যনারী ও কৃষকদের ভাষার তফাৎ সূচিত হয়ে গেছে। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংলাপ যে কতটা মাটির কাছাকাছি তা দুটি উদাহরণ থেকেই অনুধাবন করা যাবে। দুই গ্রাম্য নারীর কথোপকথনের অংশ ঃ

> সরমা। দিদি। কাঞ্চনের ত কিছু হয় নাই ?
> বিমলা। (মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।
> সরমা। ক মাস হলো ?
> বিমলা। এই সেদিন সাধ খেয়েছে।
> সরমা। ও মা সেদিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল।
> বিমলা। এ কালে ছুঁড়ী বুড়ী কিছুই চেনা যায় না। আর এক কথা শুনেছ ?[৬০]

আবার দুই প্রজার সংলাপের অংশ ঃ

> ১ম প্রজা।– বলি ও বেয়াই! রাজা বেটা বুড়োকালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছে তাই হয়ে গেছে। রাত দিন অন্তঃপুরেই থাকে; আর ক'দিন আসবো, প্রত্যহই আসছি যাচ্ছি, একদিনও বেরোয় না, তা বিচার কোরবে কি ? যেতে আসতে পায়ের নলা ছিঁড়ে গেল। . . . ?
>
> ২য় প্রজা।– ওহে ! তুমি বুঝতে পারোনি, রাজা কি সাধে ও রকম হয়েছেন ? রাজা বুড়ো, রানী কাঁচা, একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে, কাজেই পাগল হয়েছেন। বুড়ো বয়েসে বিয়ে কল্লে সকলেরই ঐ দশা হয়; তুমিও ত কিছু কিছু বুঝো।[৬১]

কোথাও কোথাও বৃত্তি অনুসারে চরিত্রের মুখে হিন্দি বাচন-ভঙ্গি বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছে। যেমন, নগরপালের কথোপকথন–

> নগর।– চোপরাও। মহারাজকা হুকুম।

অথবা– আর দেরি করণে নেহি সাক্‌তা।[৬২]

অবশ্য চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহারে লেখকের সাফল্য সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতার ছাপও থেকে গেছে। রাজা বীরেন্দ্রের দীর্ঘ সংলাপে রেবতীর রূপ বর্ণনায় সংস্কৃত বর্ণনা রীতিকে তিনি যেন অনুসরণ করেছেন। কোন কোন শব্দরূপে পদ্যরূপের ব্যবহার করেছেন। এ রকম ক্ষেত্রে সংলাপ হিসেবে তা দুর্বলই বলা যায়। যেমন—

> . . . . এই নয়নের ঈর্ষাতে কুরঙ্গিনী যে বনবাসিনী হয়েছে, তা কে না জানে ? এই দন্তের আভা হেরে সে দামিনী অভিমানিনী হয়ে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে, তবু তোমার মৃদু হাসিতে দন্তরাজী ক্ষণে ক্ষণে হেরে সময় সময় ক্ষণপ্রভা রূপে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিয়েও ত স্থির নাই।[৬৩]

আবার কোথাও কোথাও সাধু-চলিতের মিশ্রণ-দোষও থেকে গেছে। যেমন—

> রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে; (মেঘমালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হয়েছে।[৬৪]

এখানে ক্রিয়াপদে সাধু চলিতের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এই ধরণের ত্রুটি সমকালের নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটকের সংলাপেও ছিল।

এই সব সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে নাটকটির সংলাপ রচনায় মীর মশাররফ দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরনীয়, 'সোমপ্রকাশ' (১৪ ফাল্গুন ১২৭৯, ১৫ সংখ্যা) পত্রিকা মন্তব্য করে যে, নাটকটি সাধু বাংলা ভাষায় রচিত এবং চলতি বাংলায় লিখলে 'মুসলমান বলিয়া' ধরা পড়ে যেতেন।[৬৫] কিন্তু এই মন্তব্য সমীচীন নয়। কেননা নাটকটির বন্ধনীর মধ্যেকার নাট্যকারের নির্দেশ অংশগুলি ছাড়া সংলাপ আদ্যোপান্ত চলিত ভাষায় রচিত এবং তা সার্থকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন– "His drama Basanta Kurmari Natak if not well conceived, is well written."[৬৬] আনিসুজ্জামানও তাই বলেছেন, "সংলাপ-রচনায় কাঁচা হাতের ছাপ নেই।"[৬৭]

সুতরাং দেখা যায়, 'বসন্তকুমারী নাটক' তাঁর প্রথম নাটক হওয়া সত্ত্বেও নাটকে চলিত ভাষার সংলাপ ব্যবহার করেছেন এবং সাফল্যলাভও করেছেন। তাঁর এই স্বকীয় গদ্যভাষা-ভঙ্গিই পরবর্তী নাটক 'জমীদার দর্পণে' আরো পরিণত রূপ লাভ করে।

জমীদার দর্পণ

'বসন্তকুমারী নাটকে'র তুলনায় 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা ও সংলাপ আরো বলিষ্ঠ হয়েছে। 'বসন্তকুমারী'র মত দীর্ঘ সংলাপ এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে। কথোপকথন আরো স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে এবং নাট্যক্রিয়া পরিস্ফুট করতে স্বল্প-দৈর্ঘ্যের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া 'জমীদার দর্পণে' যতিচিহ্নের আরো সুষ্ঠু ব্যবহার হওয়ায় সংলাপের ভাষা হয়ে উঠেছে মাধুর্যপূর্ণ ও উপাদেয়। ভাষা সহজ এবং চরিত্র ও ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী ও কথ্যরীতি আশ্রিত। আদালতের দৃশ্যের সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই নাটকের সংলাপ চলিত ভাষায় রচিত। পরিবেশ ও চরিত্রের নাটকীয় ক্রিয়া পরিস্ফুটনে মশাররফ তৈরি করে নিয়েছেন একটি স্থিতিস্থাপক ভাষারীতি। ফলে একই পরিবেশে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে দুই ভিন্ন চরিত্রের সংলাপে যেমন পার্থক্য ঘটেছে তেমনি একই চরিত্রের দুই ভিন্ন পরিবেশেও তাঁদের কথোপকথনে পার্থক্য সূচিত হয়ে গেছে।

'জমীদার দর্পণ' নাটকে চরিত্রের শ্রেণী, সামাজিক মর্যাদা ও পরিবেশগত কারণে এই বিভিন্ন ভাষাভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে। এগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যায়, যেমন ঃ ক. উচ্চ অভিজাত মধ্যবিত্ত ও সামন্তশ্রেণীর ভাষা, খ. নিম্নশ্রেণীর গ্রামীণ প্রজা, পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ভাষা এবং (গ) উচ্চশিক্ষিত সমাজের এলিট শ্রেণী বা ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির ব্যবহৃত ভাষা।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত চরিত্রগুলি হল জমিদার হায়ওয়ান আলী, মোসাহেবদল, সিরাজআলী, উকিল, মোক্তার। এদের ভাষা তৎসম-তদ্ভব সম্পৃক্ত এবং ভদ্রজনের ব্যবহৃত মার্জিত মৌখিক ভাষা। যেমন–হায়ওয়ান আলীর উক্তি ঃ–

> হায়। জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্।– সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা কর্ত্তে হয় করবো। এখন দেউড়িতে নে যা।[৬৮]

এখানে 'নে' ব্যবহৃত হয়েছে 'নিয়ে' পদের বদলে। চলিত কথ্যরীতি অনুসারে 'করতে' স্থলে 'কর্ত্তে'র রূপ লক্ষ করা যায়। এ রকম দৃষ্টান্ত নাটকে আরো আছে। যেমন–'চল্লেম' (চললাম), কচ্ছে (করছে) প্রভৃতি। এছাড়া সেকালে সামন্তপ্রভু ও উচ্চবিত্তের লোকেরা নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে মাঝে মধ্যে আরবী, ফারসী, উর্দু মিশ্রিত ভাষা ভঙ্গি ব্যবহার করতেন। হায়ওয়ান আলী তাঁর দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে তাঁর চাকরদের তিনি হুকুম করছেন এই ভাষায়। যেমন–

> পাঁচ আদমী যাও, আবুকে পাকাড় লাও, আবি লাও।[৬৯]

এমনকি জমিদারের চাকর জামালও একই রীতিতে তার নিজের গুরুত্ব বোঝাতে এবং ভীতি প্রদর্শন করতে আবু মোল্লাকে বলে ওঠে ঃ

> তেরা বাত সে বায়ঠেগা ?[৭০]

এই নাটকের নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সংলাপ রচনায় মীর মশাররফ সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইতর শ্রেণীর চরিত্রের ভাষাই তাদের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। এদের ভাষা অমার্জিত, গ্রাম্য ও কৃত্রিমতাবর্জিত। খুব সহজ সরলভাবে তারা আপন বক্তব্য পেশ করেছে। তাদের ভাষা যেমন স্বাভাবিক তেমনি নাট্যোপযোগী। আঞ্চলিক কথ্যভাষার ঢঙ-এ দুই চাষার কথোপকথন গ্রামীণ পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলেছে। যেমন, আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহারের মৃত্যুর খবর শুনে প্রথম চাষা ও দ্বিতীয় চাষার সংলাপ ঃ

> দ্বি, চা। মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?
>
> প্র, চা। আমি কি দেখ্‌তে গিছি ?
>
> দ্বি, চা। বুঝিছি, বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাগোর বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাছ দুয়োর দিয়ে বাড়ীর মদ্দিও আসে, বেটার চাল-চলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জোলা বড় হ্যাকমত করে বলেছ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজায়গায় দেখলি আর হাকিম বলে ন্যাত কর্ব্বো না।[১১]

এই ভাষা একেবারে বাস্তবতা ঘেঁষা।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ও হাকিমদের অত্যাচারের কাছে নিজেদের অসহায়তার কথা আমিরণ নুরন্নেহারকে খুব সহজ ভাষায় জানিয়েছে ঃ

> মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি কর্ব্বে ? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস কর্ত্তে পার্ব্বে না ? নালীস কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা ? সে কি না কর্ত্তে পারে ?[১২]

কপট হরিদাস বৈরাগী আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকালে সহজ চলতি ভাষায় আপন বক্তব্য পেশ করেছে। সেই সঙ্গে তার ভণ্ডামির স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়ে গেছে। জজের প্রশ্নের উত্তরে সে নিরীহ ও অসহায় প্রজা আবু মোল্লার সম্পর্কে বলে ঃ

> হুজুর। একদিন আমি ভিক্ষে কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে; শেষে ঝোলাটা পায়ে পড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ। ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মল। রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ।[১৩]

এই ভাষাভঙ্গিই চিনিয়ে দেয় চরিত্রটি কোন্ শ্রেণীর।

আবার লেখক ইংরেজ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি চরিত্রগুলির ভাষা-ভঙ্গিও আলাদা রূপ দিয়েছেন। বাস্তবতা বজায় রাখতে এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে তিনি তাদের মুখে হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত ভাঙা ভাঙা বাংলা ব্যবহার করেছেন। এতে চরিত্রগুলি যেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি সংলাপও সরস হয়েছ। যেমন—
আসামীকে জজের প্রশ্ন ঃ

> নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম ?[১৪]

অথবা, ব্যারিষ্টারের কথোপকথন ঃ-

ব্যারি। মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে ?

জিতু। জানবে না ক্যা ? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে।

ব্যারি। আবু কেঁও মারা ?[৭৫]

এরাই আবার কখনো কখনো শুধুই ইংরেজি অথবা ইংরেজি বাংলা মিশ্রিত সংলাপ ব্যবহার করেছেন।

দেখা যায় মশাররফ চরিত্রের শ্রেণীগত পরিচয় বজায় রাখতে সংলাপ রচনায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। সে কারণে অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেন— "নাটকের সংলাপ আঞ্চলিক নহে বটে, কিন্তু চরিত্রানুযায়ী, বাস্তবধর্মী ও নাট্যরসাত্মক।"[৭৬] মন্তব্যটি যথার্থই। তবে ভাষার আঞ্চলিকতার প্রশ্নে জনৈক আধুনিক গবেষক জানিয়েছেন,— এই নাটকে "কুষ্টিয়া-ফরিদপুর এলাকার এইসব আঞ্চলিক বুলি মশাররফ ব্যবহার করেছেন।"[৭৭]

অন্যান্য রচনার মতো 'জমীদার দর্পণে'ও মীর মশাররফ অলঙ্কার ও বেশ কিছু প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। নাটকের সংলাপে এই প্রয়োগ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে বলা যায়। যেমন —

উৎপ্রেক্ষা ঃ আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক (১ম/১ম)

প্রবাদ-প্রবচন ঃ (ক) পাকা আম দাঁড় কাকে খায়। (১ম/১ম)

(খ) চাষার হাতে গোলাপ ফুল। (১ম/১ম)

(গ) কাকের উপর কামানের আওয়াজ। (১ম/২য়)

(ঘ) রাজা বাদী, উত্তর না দি। (১ম/২য়)

(ঙ) কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা। (২য়/২য়)

আবার কখনো চরিত্রের বাস্তবতা পরিস্ফুট করতে সংলাপে গ্রাম্য ছড়া, শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

(ক) সীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা। (১ম/৩য়)

(খ) যখন দেখে আঁটা আঁটি
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটী। (২য়/২য়)

সুতরাং 'জমীদার দর্পণে'র ভাষাভঙ্গিতে লেখকের যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ লক্ষ্ করা যায়। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (ভাদ্র ১২৮০) পত্রিকায় এই নাটকের ভাষাভঙ্গির প্রশাংসায় লিখেছিলেন ঃ

এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।[৭৮]

মুনীর চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের জের টেনে মন্তব্য করেন ঃ —

নাটকের সংলাপ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট হয়না, চরিত্র ও ঘটনার মর্মানুযায়ী বিচিত্রমুখী হলেই তা নাটকীয় অর্থে বিশিষ্টতা লাভ করে।[৭৯]

এই নাটকের সংলাপ এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ এর ভাষা যেমন "বিশুদ্ধ বাঙ্গালা" তেমনি সংলাপ চরিত্র ও ঘটনা অনুযায়ী বিচিত্রমুখী। সে কারণে অধিকাংশ সমালোচকই 'জমীদার দর্পণে'র সংলাপের প্রশংসা করেছেন। আনিসুজ্জামানও বলেছেন, "চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপে কিছু দক্ষতা আছে।"[৮০] সুতরাং 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা ও সংলাপে নাট্যকারের নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট।

এর উপায় কি ?

"এর উপায় কি ?" প্রহসনটিতে ব্যবহৃত হয়েছে কথ্য ভাষারীতি। এর আগের দুটি নাটকের তুলনায় এই ভাষারীতি আরো স্পষ্ট এবং পরিণত। বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে এর ভাষাভঙ্গিও অনেকটা অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত। ধনী-অভিজাত-শিক্ষিত বাবুদের স্খলন, বারবণিতার শঠতা ও প্রগল্‌ভতা, গৃহবধূর মর্মন্তুদ হাহাকার, ইয়ার-বন্ধুদের ঠাট্টা-মস্করা প্রভৃতি প্রকাশে এর ভাষা যথার্থ বাহন হয়ে উঠেছে। বাস্তবতার খাতিরে এতে লেখক এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করেছেন (যেমন – - মাগ্, মাগী, ভাতার, বেশ্যা, রাণ্ডী, বাঞ্চৎ প্রভৃতি) যা সাহিত্যে সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। সে কারণে তখন 'বান্ধব' পত্রিকা এর ভাষার বিরূপ সমালোচনাও করেছিল।[৮১] কিন্তু উনিশ শতকের অনেক নাটক-প্রহসন-নক্‌শা জাতীয় রচনায় সেকালের লেখকগণ অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

'এর উপায় কি ?'তে ব্যবহৃত সংলাপও পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী। যেমন, বারবিলাসিনী নয়নতারার সঙ্গে রাধাকান্ত বাবুর কথোপকথন ঃ

> বাঁচা গেল, সাতখানা লেপ গায়ে দাও যেখানে ফাঁক পাবে সেইখানেই শীত সেঁদবে। আগুন জ্বেলে দাও গায়ের উপরকার চামই গরম হবে। মা সুরেশ্বরী পেটে পড়লে অন্তরে বাহিরে, ভিতরে, উপরে যেন একেবারে বেলাতী কম্বলে মোড়ান হয়। বৌ ! আর এক গ্লাস দাও।[৮২]

আবার বারাঙ্গনা নয়নতারা যখন একজন পুরুষকে সঙ্গ দেয় তখন অন্য পুরুষের টের পাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলে সে খুব সহজভাবে নিজস্বভঙ্গিতেই বলে ওঠে ঃ

> পেলেই কি, আমি ত ঘরের মাগ নই যে ভয় করে ডরিয়ে চলব। এত কি ? আসে লক্ষ্মী, যার বালাই। আমি ওর জন্যে একেবারে পাগল কিনা ? সরে এস।[৮৩]

নয়নতারার আচরণে যেমন কপটতা, ছলনা ও দেহ-ব্যবসায়ের প্রবৃত্তি কাজ করেছে তেমনি তার ভাষা-ভঙ্গিমাও তার উপযুক্ত বাহন হয়েছে।

গৃহবধূ রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী মুক্তকেশীর আবেগময় কাতরোক্তি প্রকাশে ভাষা যোগ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ঃ

> সৈ মনের কথা বলি। মনে ২ আঁচ করি যে, আজ একখানা কর্ব্ব, আবার ভাবি যে, আজ না হয় কাল কর্‌ব, এই ভাবতে ২ হঠাৎ একদিন তাঁর মুখখানি নজরে পড়লো সকলই ভুলে যাই। হাসি মুখে দুট কথা শুন্‌লে, আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।[৮৪]

এই সংলাপে '২' সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে শব্দদ্বিত্ব বোঝানো হয়েছে। অবশ্য এই রীতি মশাররফের অন্যান্য রচনাতেও দেখা গেছে।

সুতরাং দেখা যায়, কখনো চরিত্রের প্রকৃতি বোঝাতে কখনো বা পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন ভাষাভঙ্গি ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপ এই প্রহসনের দুর্বলতাই প্রকাশ করে। তবে সার্বিক বিচারে 'এর উপায় কি ?'র সংলাপ রচনাতেও মীর মশাররফ হোসেনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৯০, পৃ. ১১৯

২. শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৯৫, পৃ. ২৯২

৩. ঐ, পৃ. ২৯৬

৪. ঐ, পৃ. ৩১০

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগর রচিত' (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, একাদশ খন্ড ঃ প্রবন্ধ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৩৩১

৬. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৬৫

৭. Calcutta Review, 1870, Vol. L-99
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা – সমকালের দর্পণে, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ৫৪

৮. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

৯. ঐ, পৃ. ৩৪০

১০. মশাররফ রচনা সম্ভার, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭

১১. মশাররফ রচনা সম্ভার, ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, ২য় খন্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. তিন

১২. বিষাদসিন্ধু, আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ১৫১

১৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ২য় খন্ড, গ্রন্থপ্রসঙ্গ, পৃ. নয়-দশ

১৪. আফসার আহমদ, 'মশাররফ হোসেনের গদ্য—'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা, ১৯৯১, পৃ. ১০১-১০২

১৫. পূর্বে উল্লেখিত ৭ নং সূত্র

১৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০। এর পরের উদ্ধৃতিগুলিও ঐ খন্ডেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৭. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৯
রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৩

১৮. রহস্য সন্দর্ভ, ১৮৭০ খ্রীঃ, পর্ব ৫/৫৪ খন্ড, পৃ. ৯৫-৯৬
রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৩

১৯. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, মীর মশাররফ হোসেন রচনা সংগ্রহ (১ম খন্ড), ডঃ বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, কলকাতা, কমলা সাহিত্য ভবন, ১৯৭৮, পৃ. পনর

২০. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

২১. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'বিষাদসিন্ধু' (প্রবন্ধ), মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', পৃ. ৮, ২৪

২২. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মশাররফের গদ্যরচনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ. ১১৬

২৩. কান্তি গুপ্ত, উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপ-রীতি (১৮৫০–১৯০০), কলকাতা, ইন্দুপ্রভা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৭–১০৮

২৪. রমাপ্রসাদ দে, মীর মশাররফ হোসেন ঃ মৌখিক মহাকাব্যের অনুসৃতি (প্রবন্ধ), ডঃ অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ওয়েষ্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৫১

২৫. ঐ, পৃ. ৫৩

২৬. Read, Herbert, English Prose Style, London, 1963, page-59
উদ্ধৃত, ডঃ নবেন্দু সেন, গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭১, পৃ. ২৭৪

২৭. Wimsatt, Johnson's Prose Style: Whatley's Elements of Rhetoric, 1828, p. 8
উদ্ধৃত, ডঃ নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৮. ডঃ নবেন্দু সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৯. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৪৮

৩০. মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদসিন্ধু', পৃ. ৪

৩১. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৪৯-১৫০

৩২. ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বাতায়ণ, কলিকাতা, সাহিত্য বিহার, ১৯৮৭, পৃ. ২০৬

৩৩. Calcutta Gazettee, Appendix, 31 October, 1900 : 'mark of East Bengalism'.

৩৪. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৩৫. সৈয়দ আলী আহসান, ভূমিকা, গাজীমিয়াঁর বস্তানী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. আট

৩৬. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮, পৃ. ৩৯-৪০
উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

৩৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র কবিতা সংগ্রহ, কলকাতা, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৯৯৫, ভূমিকাংশ, পৃ. ২৮

৩৮. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৫, পৃ. ৭৬

৩৯. Calcutta Gazette, 31 October, 1900,
উদ্ধৃত, মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ১১১

৪০. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৪১. মশাররফ রচনা সম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ৫ম খন্ড, পৃ. ৬

৪২. সিরাজুদ্দীন আমেদ, মীর মশাররফ হোসেন, নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৬৪

৪৩. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৩২, ২৩৮-৩৯

৪৪. ঐ , পৃ. ৩০৮

৪৫. শামসুজ্জামান খান, নানাপ্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬

৪৬. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ১২, ১৮, ৭৩

৪৭. ঐ , পৃ. ২৮৭

৪৮. ঐ , পৃ. ৩০২, ৩০৩

৪৯. ঐ , পৃ. ৭১

৫০. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৫১. মশাররফ রচনা সম্ভার, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৫২-৪৫৩

৫২. ঐ , পৃ. ৩৭১

৫৩. ঐ , পৃ. ৪০০–৪০১

৫৪. কান্তি গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৫৫. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৯

৫৬. ঐ , পৃ. ৩০৪

৫৭. শেখ আবদুস সোবহান, 'আর নীরব থাকা গেল না' (প্রবন্ধ), 'আখবারে এসলামীয়া' (পত্রিকা), পৌষ ১২৯৬, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ৭৪

৫৮. মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৮

৫৯. ঐ , পৃ. ১৬০

৬০. ঐ , পৃ. ১৩১

৬১. ঐ , পৃ. ১৩৫-৩৬

৬২. ঐ , পৃ. ১৭৮-৭৯

৬৩. ঐ , পৃ. ১৪২

৬৪. ঐ , পৃ. ১২৮

৬৫. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৬-৩৭

৬৬. ঐ , পৃ. ৫৯

৬৭. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১৯৭

৬৮. 'জমীদার দর্পণ', বিষাদসিন্ধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

৬৯. ঐ , পৃ. ২৯২

৭০. ঐ , পৃ. ২৯৩

৭১. ঐ , পৃ. ৩০৫

৭২. ঐ , পৃ. ২৯৭

৭৩. ঐ , পৃ. ৩০৯–১০

৭৪. ঐ , পৃ. ৩০৮

৭৫. ঐ , পৃ. ৩০৯

৭৬. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৯৮৫, পৃ. ১২৫

৭৭. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৯

৭৮. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৮

৭৯. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৮০. রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা — সমকালের দর্পণে, পৃ. ১৩৯

৮১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

৮২. মশাররফ রচনা-সম্ভার, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৯

৮৩. ঐ , পৃ. ২৬৭

৮৪. ঐ , পৃ. ২৭২–৭৩